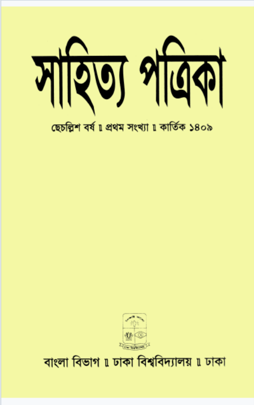

Vol. 46 | No. 1 | 2002

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নিবারণ পণ্ডিতের গানে প্রতিবাদী চেতনা

Volume	46
Issue	1
Year	2002
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শরীফ আতিক উজ্-জামান
Published online	October 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v46i1.420
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v46i1.420
Pages	109-140
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

নিবারণ পণ্ডিতের গানে প্রতিবাদী চেতনা

Check for updates

শরীফ আতিক উজ্-জামান*

উচ্চ সাহিত্যমূল্যের স্বীকৃতি, মানবতাবাদী দর্শন ও প্রতিবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ সত্ত্বেও লোককবি নিবারণ পণ্ডিতের গানের ব্যাপক প্রচার ঘটেনি, বরং ধীরে ধীরে তাঁর গান শ্রোতা ও সুধীজনের দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছে। ব্যাপক বিষয়-বৈচিত্র্য ও সুরমাধুর্য নিয়েও শুধুমাত্র প্রচারহীনতার কারণে তাঁর গান একদিকে প্রবীণরা যেমন বিস্মৃত হচ্ছেন অন্যদিকে নবীনদের সাথে তেমন কোন পরিচয়ই ঘটছে না। কিন্তু তাঁর গানগুলো বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে। রচিত গানের মাধ্যমে তিনি বিগত শতাব্দীর বিশেষ করে দেশভাগের (১৯৪৭) অব্যবহিত পূর্বের ও পরের উল্লেখযোগ্য কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা- সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মন্বন্তর, লবণ ও বস্ত্র সংকট, টংক- প্রথা বিরোধী আন্দোলন, শরণার্থীদের দুর্দশা, যুদ্ধবিরোধী চেতনা ও উনিশ শতকের সাড়া জাগানো নীল বিদ্রোহের ইতিহাস– ধ'রে রাখতে প্রায়াসী হয়েছেন। সেই নিরিখে তার গানের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। সেই সব ঘটনায় অত্যাচারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বঞ্চনা-ব্যথা-বেদনা তিনি যেমন দরদী মন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন তেমনি দ্রোহী মন নিয়ে সেই অনাচারের প্রতিবাদ করেছেন। সেই প্রতিবাদী চেতনাই তার গানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

নিবারণ পণ্ডিত জন্মেছিলেন ১৯১২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী কিশোরগঞ্জের সগড়া গ্রামে। তার বাবা ভগবানচন্দ্র শিক্ষকতা করার সুবাদে 'পণ্ডিত' উপাধি পেয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে তার উত্তরসূরিরা ব্যবহার করেছেন। মাত্র দশ বছর বয়সেই নিবারণ পণ্ডিত পিতাকে হারান। কৃষিনির্ভর পরিবার হওয়ায় জমি থেকে প্রাপ্ত ফসলে তাঁর আর তাঁর মায়ের কোনরকমে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু পরপর কয়েক বছর ফসলহানি হওয়ায় তারা খাদ্য কষ্টের মধ্যে পড়েন। এ অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁর নিজের জবানীতে : দিন যাচ্ছিল কোনক্রমে, কিন্তু পরপর কয়েক বছর অজন্মার ফলে আমাদের মা-বেটার সংসারও অচল প্রায় হ'ল। বিড়ি বেঁধে কিছু আয়ের চেষ্টা করেছি ঐ সময়টাতে।'[১] কবির আত্মকথন থেকেই জানা যায় যে, মহাজনী চক্রান্তে সেই আয়ের পথও বন্ধ হয়ে যায়। আর এই অভাব অনটনের

* প্রভাষক, ইংরেজী বিভাগ, সরকারী পাইওনিয়র মহিলা কলেজ, খুলনা।

মধ্যে তার লেখাপড়াও বেশীদূর এগোতে পারেনি। কিশোরগঞ্জের রমানন্দ স্কুলে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তিনি। তবে ছোট বয়সেই গান- কবিতা রচনা করার প্রকৃতি প্রদত্ত গুণাবলীর কারণে তিনি সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। গায়ক বাদকরা তাকে দলে নিয়ে যেতেন। এভাবেই গানের প্রতি অতিমাত্রায় অনুরক্ত হয়ে পড়েন।

প্রথমদিকে কবি 'প্রেম ও ভক্তিরসের গান রচনা করে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ক্রমে বাস্তবের আঘাতে তাঁর চিন্তাক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসতে থাকে। পরিদৃশ্যমান বাস্তব জগতকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না।... তিনি তাঁর গানে মানুষের প্রতি অবিচারের কথা তুলে ধরেন।... এমনই এক সময়ে কৃষক আন্দোলন তথা কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়।'[২] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) চলাকালীন সময় ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪১), পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), হাজং কৃষকদের টং প্রথা বিরোধী আন্দোলন, স্বাধীনতার পরপরই জন্মভূমি দুর্বল করে আসা বিপুল শরণার্থীদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ও যুদ্ধ-বিরোধী চেতনা তার গানে বিশেষভাগে লক্ষ্য করা যায়।

দেশবিভাগ (১৯৪৭)-এর পরও বিবারণ পণ্ডিত কিশোরগঞ্জেই ছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানে তখন বামপন্থী নেতাকর্মীদের উপর ব্যাপক-পীড়ন চলছে। কৃষক-স্বার্থ বিরোধী একটি ভূমি বিল লীগ সরকার কর্তৃক আনা হলে কবি তার উপর একটি পুস্তিকা রচনা করে গাইতে থাকেন। বিষয়টি সরকার সুনজরে দেখেনি। ফলে ১৯৫০ সালে আনসার বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কারাগারে তার উপর বয়াবহ নির্যাতন চালানো হয়। সেই নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে তিনি তার বন্ধু, গণসঙ্গীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে এক পত্রে লেখেন :

> সতর মাস অজ্ঞাতবাস থাকার পর পাকিস্তান সরকারের দশম হামলায় আমি ধরা পড়ি ও নোয়াখালীর কুখ্যাত গোলাম সরওয়ারের হাতে পড়ি। তারপর বন্ধু জার্মান ও জাপানী ফ্যাসিস্টদের পৈশাচিক অত্যাচারের যে সকল নির্মম কাহিনী কাগজে পড়িতাম বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার সম্মুখিন হইলাম এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলাম। সকাল আটটা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেহের উপর বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার চলিল। কখনো জ্ঞান ছিল কখনো ছিলনা। অবশেষ একটি ছোট্ট কুঠুরিতে রেলিং-এর সাথে পাহ-পা বাঁধিয়া মাংসপিণ্ডের মত ফেলিয়া রাখা হইল।[৩]

১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে নিবারণ পণ্ডিত মুক্তি পেয়ে একেবারে শূন্য হাতে দেশ ত্যাগ করে পশ্চিম বাংলায় চলে যায়। নয়জন মানুষের সংসার নিয়ে বিনা উপার্জনে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাতে থাকেন। ধীরে ধীরে বিভিন্ন পুস্তিকা রচনা করে ছাপিয়ে বিক্রি করে তা থেকে অর্জিত অর্থে জীবনের ব্যয় নির্বাহ করতে থাকেন। ১৯৬২ সালে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তার চলাফেরা সীমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তার রচনা থেমে থাকেনি। কিন্তু ১৯৭৬ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসায় কিঞ্চিত উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও তিনবাছর পর ক্যান্সার ধরা পড়ে। কলকাতায় দীর্ঘদিন চিকিৎসা করেও তেমন কোন ফল লাভ হয়না। ১৯৮৪ সালের ১লা নভেম্বর কোচবিহারে নিজ বাড়িতে শিল্পী নিবারণ পণ্ডিত মৃত্যুবরণ করেন।

নিবারণ পণ্ডিতের গানের সংখ্যা আনুমানিক তিনশত। কিন্তু তার সবগুলোর হদিশ পাওয়া যায় না। অযত্ন- অবহেলায় তার অনেক রচনা হারিয়ে গেছে। তবুও যতটুকু পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় তার গানগুলির ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রয়েছে যে কথা

জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের নেতা, স্থানীয় পীরের মাজার বা খানকার দেখভালের দায়িত্বে নিয়োজিত গোলাম সারোয়ার হোসাইনী। ১৯৪৬ সালে যার উস্কানিতে নোয়াখালীতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। যে ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি গানগুলি রচনা করেছিলেন তার নিরিখে গানগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

১. সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গাবিরোধী গান
২. মন্বন্তরের গান
৩. লবণ-বস্ত্র ও ঔষধ সংকট সৃষ্টিকারী দুর্নীতিবাজ মজুতদারদের মজুতদারী ও কালোবাজারীর প্রতিবাদে রচিত গান।
৪. কৃষক আন্দোলনের গান
হাজং কৃষকদের টং প্রথাবিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে রচিত গান
৫. শরণার্থীদের দুর্দশা বর্ণনায় রচিত গান
৬. যুদ্ধবিরোধী চেতনার গান
৭. নীল বিদ্রোহের গান।

উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগে বিন্যস্ত গানগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা গানগুলোর ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত এই লোককবির প্রতিবাদের ধরন ও সংগ্রামী চেতনার স্বরূপটিকে জানার চেষ্টা করবো।

(১) সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গা বিরোধী গান ঃ

১৯৪১ সালে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। ময়মনসিংহ ও খুলনায় দাঙ্গাবস্থা সৃষ্টি হয়। সেই দাঙ্গায় উল্লেখ পাই তাঁর একটি গানে :

শুনতে পাই টাকা সরে, মানুষে মানুষ মারে
ঘর পোড়ায় দিন-দুপুরে, করে নানা অত্যাচার
যে যাহারে পোড়ায় যেথায় পায়, ছুরিকাঘাত করে গায়।
পিছন থেকে মারে মাথায়, নাই তার কোন প্রতিকার।

[নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ১৫]

গানটি পূর্ণাঙ্গ নয় আংশিক সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ১৯২৪ থেকে ১৯৪১ সালের প্রতি বছরই ভারতের কোথাও না কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে যার উল্লেখ পাওয়া যায় তাজুল ইসলাম হাশমী'র *Peasants Utopia* গ্রন্থে :

> The period between 1924 and 1925 can be regarded as one of transition. It witnessed the sudden rise in the intensity of communalism throughout. Bengal, which has its first major outburst in the Calcutta riots of 1926, followed by Hindu. Muslim riots in many parts of Bengal. [8]

বাংলা ছাড়াও ১৯২৩ সালে অমৃতসরে, ১৯২৪ সালে দিল্লীতে, ১৯২৫ -এ কোলকাতা-দিল্লী-ফতেপুরে, ১৯২৬ সালে তিনদফায় কোলকাতায়, ১৯২৭ সালে পটুয়াখালী লারকানা-নদীয়া-মুলতানে ১৯২৮-এ ব্যাঙ্গালোর-স্যুরাতে-তামিলনাড় র তিরুপুরে, ১৯২৯ সালে বোম্বাইয়ে, ১৯৩০ সালে ঢাকায়, ১৯৩১-এ কানপুরে ১৯৩২ সালে আবার বোম্বাইয়ে, ১৯৩৩ সালে আলোয়ারে, ১৯৩৪ সালে কাশ্মিরের শ্রীনগরে, ১৯৩৫-এ হাজারীবাগ-রাজশাহী-হায়দ্রাবাদ-লাহোরে, ১৯৩৬ সালে পুনায়, ১৯৩৭ সালে হরিয়ানা- মাদ্রাজ-পাঞ্জাব-সিন্ধুতে ১৯৩৮ -এ লখনউতে, ১৯৩৯ সালে আসানসোল-কানপুর-বারানসী ও কোলকাতার কাশিপুরে, ১৯৪০ সালে সিন্ধুর শুক্কুরে এবং ১৯৪১ সারে ফের ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে। উদ্দেশ্যমূলক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার গুটিকয়েক ঘটনা বাদ দিলে নারীদের সাথে দুর্ব্যবহারের কথিত অভিযোগ, বালকদের ঝগড়া, গো-হত্যার বাঁধাপ্রদান, বন্দে মাতরম ধ্বনি দেওয়ায়, হোলি উৎসব বা মহরমের শোভাযাত্রায় অহেতুক বাঁধা প্রদান, ঘুড়ি ওড়ানো ইত্যাদি সামান্য ঘটনা নিয়ে ভয়াবহ দাঙ্গা

সংগঠিত হয়েছে। ১৯৪১ সালে ঢাকায় যে দাঙ্গা সংগঠিত হয় তার কারণও অতীব তুচ্ছ। হোলি উৎসবে কতিপয় মুসলিম বালকের গায় তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রঙ্গিন পানি ছিটানো হয়। বিষয়টি শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে না যেয়ে অতি উৎসাহিরা অনর্থক উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করে। এই দাঙ্গা ঢাকা-নারায়ণগঞ্জসহ আশপাশের গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। পণ্ডিতের গানে ছুরিকাঘাতে মৃত্যুর ও প্রহৃত হওয়ার যে বর্ণনা পাই তার সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'দাঙ্গার ইতিহাস' বইতে :

> ১৯৪১ সালে ঢাকা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠে। দাঙ্গার সূত্রপাত, প্রাধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবের বিধানসভার এক বিবৃতি অনুযায়ী, কয়েকজন বালকের ১৪ই মার্চ হোলির দিন কিছু সংখ্যক মুসলমানের গায়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রঙ্গীন জল দেওয়াকে উপলক্ষ করে। বড়দের হস্তক্ষেপে যে ঘটনার শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে পারতো, তদানীন্তন অত্যন্ত উত্তেজনাকর মানসিকতার জন্য তার বদলে দাঙ্গা ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ এবং গ্রামাঞ্চলকে ক্রমশ বাড়বানলের মত গ্রাস করল। পরবর্তী প্রায় ছয়মাস ঢাকায় দফায় দফায় দাঙ্গার অগ্নুৎপাত ছাড়াও বিচ্ছিন্নভাবে ছুড়িকাঘাত ও প্রহৃত হবার ঘটনার পৌনঃপুনিক অনুষ্ঠান ঘটতে থাকে।[৫]

এই দাঙ্গার ধারাবাহিকতা চলেছে দেশভাগের পরও এবং এখনও কিছুমাত্র কমেনি। এ এক বিরামহীন দুর্দৈব। সাম্প্রদায়িকতা ভারতের রাজনীতির এক অনিরাময়যোগ্য ব্যাধি। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠি, তাদের দালাল ও সুবিধাভোগী শ্রেণী দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক কখনো মধুর হতে দেয়নি যদিও শুভবোধ সম্পন্ন শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের মাঝে সর্বদাই সুসম্পর্ক ছিল। কিন্তু রাজনীতির দাবাখেলায় সবসময় এই দুই সম্প্রদায় ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বৃটিশদের 'ডিভাইড এন্ড রুল' পলিসি কেমন ছিল তার একটি চমৎকার বর্ণনা পাই প্রগতি মাইতির জবানীতে :

> ইংরেজদের 'ডিভাইড এণ্ড রুল পলিসি'র জালে কংগ্রেসও সরাসরি ধরা পড়ে গিয়েছিল। গভর্ণর ল্যান্সডাউন হিন্দুদের পরামর্শ দিতেন গোরক্ষা আন্দোলন চালিয়ে যেতে, এবং মুসলমানদের উপদেশ দিতেন গো-হত্যা করতে।[৬]

তবে 'বিভক্ত কর ও শোষণ কর' নীতি সুচতুর ইংরেজ এদেশে ক্ষমতা গ্রহণের একেবারে শুরু থেকেই চালিয়ে আসছিল। কারণ হিন্দু ও মুসলমানদের

বৃহত্তর ঐক্য শাসকদের জন্য নিশ্চিত হুমকি হতে পারতো। ফলে সুকৌশলে তারা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছিল। যা থেকে পরবর্তীকালে স্থায়ী কলহের অংকুরোদগমের মাধ্যম হয়ে ধীরে ধীরে ডালপালা বিস্তার করে বিশাল কন্টকবৃক্ষ সৃষ্টি করেছে। এই বিষয়ে নজরুল ইসলামের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭) জয়লাভ করে এদেশের ক্ষমতা দখল করে ইংরেজরা বহু পত্র লিখে হিন্দুদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, মুসলমান শাসকদের অত্যাচারে হিন্দুদের ধর্ম-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, ইংরেজরা তাদের উদ্ধার করেছেন। হিন্দুদের একটা বড় অংশ এই টোপ গিলে মুসলমানদের অত্যাচারী ও সদাশয় ইংরেজ শাসনকে পরমোপকারীরূপে বর্ণনা করতেন। এতদসত্ত্বেও যখন জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হ'ল, তখন ইংরেজ শাসকরা ভোল পাল্টে মুসলমানদের রক্ষাকর্তা সেজে গেলেন। ১৮৭০ সাল নাগাদ তারা মুসলমান নেতাদের বোঝাতে লাগলেন যে, দেশ স্বাধীন হলে দেশে সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। হিন্দুদের হাতে মুসলমানদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। অতএব ইংরেজ শাসন টিকিয়ে রাখাই মুসলমানদের পক্ষে মঙ্গল। মুসলমান নেতারা ঢোক গিলে দেশের বৃহত্তম স্বার্থের কথা ভুলে শুধু মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করতে লাগলেন।[৭]

আর এই কারণে এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায় কখনো বিরোধের সর্বনাশা চোরাবালি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। ক্ষমতা-লিপ্সা, রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও সহিংসতার কারণে শেষপর্যন্ত ভারত বিভক্ত হয়েছে। অহিংসা ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক ভিত্তির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলেও সবচেয়ে বড় 'আয়রনি' হ'ল, ভারত সবসময়েই একটি দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ দেশ। ভারতীয় সমাজ ধর্মের ক্ষেত্রে বিভক্ত। এই সমাজে যে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো ছিল তারা একক সত্তা হিসাবে কাজ করতে পারতো, কিন্তু সামাজিক-রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে তা সম্ভব হয়নি। আর এই কারণেই সাম্প্রদায়িকতাও শেষ হতে পারেনি। এই বক্তব্যের সমর্থন পাই বিপিন চন্দ্রের বক্তব্যে :

> .... ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী ছিল এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ এক ছিল। তারা এই সবকটি ক্ষেত্রে একক সত্তা হিসাবে কাজ করতে পারতো। হিন্দুদের

> বা মুসলমানদের 'কথা' বা 'চিন্তা' সম্বন্ধে এমনভাবে উল্লেখ করতেন যাতে মনে হতো যেন এরা প্রত্যেকেই এক একটি স্বতন্ত্র সত্তা। এমনকি, কখনো কখনো তাঁরা 'হিন্দু নেতা' বা 'মুসলমান নেতা'দের সম্বন্ধেও লিখতেন। এইভাবে দ্বি-জাতিতত্ত্বকে তাঁরা (কেউ কেউ আবার শিখদের এবং অন্যান্যদেরও টেনে এনে এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করেছেন) মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভারতের ইতিহাস টেনে এনেছেন এবং ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করেছেন।[৮]

সাম্প্রদায়িকতা আধুনিক ভারতের চেতনার গভীরতর স্তরে প্রবিষ্ট। এই দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের প্রবল প্রভাবও অনুরাগ থেকেই এই মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। তবে এও সত্য অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ঐক্যের ভিত্তিতে যে জাতীয়তাবাদ তা ভারতীয় জনগণের চেতনার গভীরে সঞ্চারিত হতে পারেনি বলে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবমুক্ত হওয়া সম্ভব হয়নি। আর এই বিষয়টি ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী খুব ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছিল বলেই ভারতীয়দের ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে ইচ্ছামত খেলাটা তাদের পক্ষে অনেক সহজ হয়েছে। তৎকালীন অনেক নেতা অবশ্য বিষয়টি বুঝেও শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা সাময়িক রাজনৈতিক সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়টিকে উপেক্ষা করতে না পারার কারণে কোন প্রকার প্রগতিশীল ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। আর তাই এইসব তথাকথিত দেশহিতৈষী রাজনীতিবিদরাও ভোট-বৈতরণী পার হতে সস্তা ধর্মীয় জিগির তুলে সুবিধা লাভের চেষ্টা চালিয়েছেন। এই ধারা এখনো বলবৎ আছে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে হিন্দু-মুসলমান প্রার্থীদের ভোট প্রার্থনায় ধর্মীয় পরিচিতি ব্যবহারের বিরুদ্ধে পণ্ডিতের লেখায় প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে :

শুনতে পাই হাটবাজারে এবার যত জমিদারে
টাকা-পয়সা খরচ করে ভোট নিবেন কিনিয়া
খদ্দর টুপি ধরেছেন কেহ কোলাব্বর ছাড়িয়া
আইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করেন কেমন আছেন সেলাম দিয়া।

কেউ কেউ লীগের নাম ধরে বলছেন লম্বা উয়াজ পড়ে
এবার ভোট দাও আমারে মুসলমান বলিয়া

আমি আছি লীগের মেম্বর সাত বছর ধরিয়া
এবার ভোট না দিলে হিন্দু যাবে স্বরাজ লইয়া।

[নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ৫২]

এই ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৩৫ সালের নির্বাচন পদ্ধতি অনুসারে। ১৯৩২ সালে Communal Award প্রবর্তনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে আইনসিদ্ধ করা হয়। এ্যাসেম্বলীতে মুসলমান, নিম্নবর্ণ এবং দলিত-অস্পৃশ্যদের জন্য যেরূপ আসন বন্টন করা হয় তার উল্লেখ আছে তাজুল ইসলাম হাশমীর গ্রন্থে :

> The 'Communal Award' announced by the British Prime Minister Ramsay Mcdonald on 16 August 1932 was a precursor to the act of 1935. It caused great resentment among the Hindu *bhadralok* and the *zamindars* as it curtailed their power in the proposed Legislative Assembly of Bengal. In sofar as Bengal was concerned — the award granted 120 seats to the Muslim community, 30 to the Scheduled Caste and 10 for the Depressed Classes in an assembly of 250 members.[৯]

১৯৩৫ সালে চালুকৃত **ভারত শাসন আইন** এই আইনেরই নিশ্চয়তা বিধান করে। কংগ্রেস ১৯৩৫ সালে দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সম্মেনে Communal Award-এর বিরোধিতা করলেও **ভারত শাসন আইন**-এর বিরুদ্ধে টু শব্দটি করেনি এবং এই আইনের আওতায়ই ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যার সমর্থন মেলে মনি সিংহের জবানীতে :

> ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে সারাদেশ ব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয়। এই নির্বাচন ছিল সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে । অর্থাৎ হিন্দুরা হিন্দু প্রার্থীদের আর মুসলমানগণ মুসলমান প্রার্থীদের ভোট দিবে। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় আইন পরিষদেই নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। এর ভিত্তি ছিল ১৯৩৫ সালের নির্বাচন পদ্ধতি।[১০]

> এই আইন ভারতের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি আরো সুদৃঢ় করেছে। দুই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ঐক্যের পক্ষে এমন একটি আইন ভয়ানক প্রতিবন্ধকরূপে হাজির হয়েছিল একথা নিশ্চিত করে বলা যায়। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা সেদিন আপন স্বার্থ চিন্তায় এমনই মগ্ন ছিলেন যে, এর সুদূরপ্রসারী ক্ষতির দিকটি বুঝতে পারলেও চুপ করে ছিলেন। তৎকালীন নেতৃত্বের এহেন অবিমৃশ্যকারী আচরণ ভারতের রাজনীতির সামগ্রিক গতিপথ পাল্টে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে পুনশ্চঃ নজরুল ইসলাম ঃ
>
> ... কৃষক ও প্রজাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই ফজলুল হক, আক্রাম খাঁ, নওশের আলি, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ নেতাদের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল কৃষক প্রজা পার্টি। এটা কোন সাম্প্রদায়িক সংগঠন ছিল না। কিন্তু নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছ ও প্রসারিত না হওয়ার জন্য ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে এই দলের নেতারা শুধুমাত্র মুসলমান আসনেই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমিত রাখলেন। ফলে পিছনের খিড়কি দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা ঢুকলো। পরবর্তীকালে ফজলুল হকের নেতৃত্বে এই দলের বড় অংশ মুসলিম লীগের সঙ্গে মিলে গেল। পরিণতি হল বাংলা বিভাগ।[১১]

প্রকৃতপক্ষে' রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার কখনোই বন্ধ করা যায়নি। সেকুলার পন্থীরা মিন মিন করে কথাটা মাঝে মাঝে তুলেছেন বটে কিন্তু রাজনীতি থেকে ধর্মকে পুরোপুরি পৃথক করে ফেলা কখনওই সম্ভব হয়নি। রাজনীতিকরা সময়-সুযোগমত ধর্মকে কাজে লাগিয়ে বরাবরই কোনও না কোনও তাৎক্ষণিক কিংবা দীর্ঘমেয়াদী ফায়দা ওঠাতে চেয়েছেন। বিশেষ করে ভোটের রাজনীতিতে স্থান-কাল-পাত্র বিচারে ধর্মীয় সেন্টিমেন্টের কোনওরকম সুযোগ নেননি বলে দাবী করতে পারেন এমন রাজনীতিক বিরল।'[১২] নিবারণ পণ্ডিত তার এই গানের মাধ্যমে এই সাম্প্রদায়িক নির্বাচন পদ্ধতির প্রতিবাদ করার সাথে সাথে রাজনৈতকি নেতাদের প্রগতিশীলতার মুখোশ ঢাকা সাম্প্রদায়িক চেহারাটা উলঙ্গ করে দেখিয়েছেন।

(২) মন্বন্তরের গান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতে স্মরণাতীত কালের মধ্যে ভায়বহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই মন্বন্তর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ঘটেছিল এমন ভাবার কোন অবকাশ নেই। এ ছিল মনুষ্যসৃষ্ট এক অমানবিক বিপর্যয়। শাসককুলের নিদারুণ

ব্যর্থতার সুযোগে দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ী শ্রেণী অধিক মুনাফা শিকারের জন্য খাদ্যশস্য গুদামজাত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছিল এবং এই সময় ব্যবসায়ী শ্রণী সরকারের কাছে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের বেশীমাত্রায় উৎসাহী ছিল কারণ 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হেতু বাংলায় বহুসংখ্যক সৈন্যের আবির্ভাব ঘটে এবং যুদ্ধোপকরণ নির্মাণের জন্য কলকারখানায় বহিরাগত শ্রমিক নিযুক্ত হয়। তাদের জন্য সরকার প্রচুর পরিমাণ চাল-ডাল-গম প্রভৃতি খাদ্যশস্য বাজার দরের তুলনায় বেশী দরে বাজার থেকে কিনে নিতে থাকে। ফলে ব্যবসায়ীরা সরকারের কাছে খাদ্যশস্য বিক্রিতে সচেষ্ট থাকে। দেশের মোট খাদ্যশস্য থেকে একটি বড় পরিমাণ অংশ সৈন্যখাতে চলে যায়।[১৩] তাছাড়া ১৯৪৩ সালে চাহিদার তুলনায় খাদ্যশস্যের অপ্রতুল উৎপাদন, জাপানীদের আক্রমণের ভয়ে বার্মা থেকে আগত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর চাপ, সময়মত ঘাটতি পূরণে সরকারী উদ্যোগহীনতা, জাপানী আগ্রাসন প্রতিহত করার লক্ষ্যে চাষীদের ঘর থেকে শস্যের মজুদ সরিয়ে ফেলার জন্য বেশী দামে শস্য ক্রয়, কোথাও কোথাও ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে ফেলা, ত্রুটিপূর্ণ খাদ্য সংগ্রহ অভিযান ও বন্টন ব্যবস্থা, চোরাকারবারী বন্ধে সরকারী ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর মূলত এই সুযোগেই অসৎ ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে দুর্ভিক্ষের অবশ্যম্ভাবীতা এড়ানো সম্ভব হয়নি। যে কারণে প্রাণ হারিয়েছিল লাখ লাখ বঙ্গ সন্তান। 'সরকারী হিসাবে এতে ১৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। বেসকারী হিসাবে মৃত্যুর সংখ্যা ৩৫ থেকে ৪০ লক্ষ বলে অনুমান করা হয়।'[১৪] এই বিপর্যয় নাড়া দিয়েছিল নিবারণ পণ্ডিতের মত লোককবিকে। মানুষের সেই দুর্দশার কাহিনী উঠে এসেছে তার রচিত গানে :

হারে ও কৃষক ভাই
মোদের কি আর বাঁচিবার উপায় নাই।

হায় হায়রে—
থালা বাসন হাঁড়িকুড়ি গৃহস্থের বেসার
ক্রমে ক্রমে বিক্রি করে চলিছে সংসার।
অভাব গ্রস্ত প্রায় সমস্ত গৃহস্থ বেকার।
অস্থি চর্মসার হইয়াছে থাকি অনাহার।

[নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ৪০]

মন্বন্তরের কারণে অনেক সচ্ছল মানুষ তাদের সমস্ত সহায়-সম্বল হারিয়ে পথে নেমে ভিক্ষা করেছে। ভিক্ষাও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় শুধুমাত্র দুমুঠো অন্নের জন্য মহিলাদের ঝি-এর কাজ থেকে শুরু করে পতিতাবৃত্তি পর্যন্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল। ইতিহাসে এই রকম অমানবিক বিপর্যয়ের ঘটনা খুব কমই আছে। তবে পৃথিবীতে সব বড় বড় বিপর্যয়ের মূলেই রয়েছে মানুষের ঘৃণ্য চক্রান্ত ও স্থূল স্বার্থবুদ্ধি। '৪৩-এর মন্বন্তর মানুষকে অকস্মাৎ এক ভয়াবহ সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সেই সংকটের মুখে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের বদলে নীরব আত্মসমর্পণে লাখ লাখ মানুষের জীবন প্রদীপ নিভে গেছে। '..... এদিকে মৃত্যু ও অন্যদিকে গৃহত্যাগপূর্বক শহরমুখী হওয়ার ফলে গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য বিরাণভূমিতে রূপান্তর, নারীর যৌবনভোগে বিত্তবানদের ব্যাপক সুযোগ, কলকাতা শহরে অনাহারী মানুষের বাঁধভাঙ্গা ঢল, গৃহে-গৃহে-পথে-পথে ডাষ্টবিনে লঙ্গরখানায় শুধু খাদ্যান্বেষণে ছুটে চলা, কালোবাজারি ও চোরাকারবারী ব্যবসায় অমানুষিক জুলুম, গৃহে -গৃহে প্রান্তরে সর্বত্র অনাহারী মানুষের মৃতদেহ প্রভৃতি বৃহৎবঙ্গের দুর্ভিক্ষকালীন এক অবর্ণনীয় দুর্দশার চিত্র।[১৫] এইসব করুণ কাহিনী ধরা পড়েছে পণ্ডিতের একাধিক গানে :

গ্রামের মানুষের ধ্বংসের বন্যায় ভাসিয়া চলেছে হায়
কে বাঁচাবে তোরা, কে বাঁচাবে, ওরে আয়, ওরে আয়।
সান্ধ্য প্রদীপ জ্বলে নারে আর
সোনার পল্লী হলো যে আঁধার
নিশ্চিহ্ন হইল কত পরিবার
গ্রামবাসী আজ অসহায়!

পল্লীবধু আজ ভিখারিনী সেজে
দ্বারে দ্বারে ঘুরে অন্নবস্ত্র খোঁজে
কেউবা লাগিছে দাসীপনা কাজে
কেউবা পথের ধুলায়।

উঠানে উঠানে শ্মশান কবর
মানুষে মানুষে নাইরে খবর
কারবা বাড়ি কারবা ঘর
শিবা ডাকে আঙ্গিনায়॥

চলে গেছে আজ বহু গ্রামিকান
চলে গেছে কত শিশু ও সন্তান
এখনো যাদের আছে ক্ষীণ প্রাণ
কে বাঁচাবি ওরে আয়॥

[নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ১৯]

১৯৪৩-এর মন্বন্তরের সময় মানুষের সাথে প্রথম পরিচয় ঘটলো মজুতদার-কালোবাজারী নামের নতুন এক দুর্বৃত্ত শ্রেণীর যাদের অবিমৃশ্যকারী আচরণে লক্ষ লক্ষ নিরীহ-নারী-পুরুষ-শিশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। প্রকৃত পক্ষে, তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তরের পশ্চাতে চোরাবাজারের ক্রিয়াকলাপ ও চোরাকারবারীদের অর্থগৃধ্নুতাই সর্বপ্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। '[১৬] এই গানে বিপর্যস্ত মানবাত্মাকে বাঁচানোর আকুল আবেদন তার গানে প্রকাশিত হয়েছে কারণ তখন ন্যায়নীতি-আদর্শ-বিবেক-প্রচলিত মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়গুলোই ভয়ানক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়।

(৩) লবণ ও বস্ত্র-সংকটের প্রতিবাদে রচিত গান ঃ

যুদ্ধকালীন সময় শুধুমাত্র খাদ্যসংকট হয়েছিল তাই নয়, দুর্ভিক্ষের পরের বছরই লবণ ও ভয়াবহ বস্ত্র সংকট দেখা দেয়। সরকার অন্ন-বস্ত্র ও লবণের সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য কন্ট্রোল ব্যবস্থা চালু করে যার উদ্দেশ্য পুরোপুরি ব্যর্থ হয় বরং এই ব্যবস্থা অকস্মাৎ ব্যবসায়ীদের সামনে অবৈধ সুযোগ এনে দেয় মুনাফা শিকারের। আর ব্যবসায়ীরাও তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করে রাতারাতি অর্থবিত্তে ফেঁপেফুলে উঠে। এই প্রসঙ্গে ড. বিনতা রায় চৌধুরীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

> ... সরকার দুর্ভিক্ষরোধ প্রকল্পে কন্ট্রোল দোকান চালু করলেও দোকানগুলি মানুষকে খাদ্য যোগাতে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার কারণ ছিল দুটি; প্রথমত সরবরাহের অভাব। কন্ট্রোল দোকানগুলিতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য ছিল তা জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্য। দ্বিতীয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীর অসাধুতায় কন্ট্রোলের খাদ্যশষ্য গোপনে চোরাবাজারে বিক্রি হতে থাকে। ফলে অনেকেই সেই খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়।[১৭]

তাদের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদকল্পে এই লোককবির কলম ক্ষমাহীন। এদের উদ্দেশ্যে তাই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তিনি বলতে পারেন :

খোঁজ কর ভাই কোন্ কোন্ শয়তান
এদের সাথে দেয়রে যোগান
কোন বাজারে হয়রে চালান লবণ-চিনি-তেল কাপড়॥
চিনে রাখো গাঁয়ে তোমার কে কে নূতন মাতব্বর
কার বাড়ীতে যায়রে রাত্রে লবণ-চিনি-তেল-কাপড়॥

[নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ৩৬]

বস্ত্র-সংকটের ফলে নারীদের ঘরের বের হওয়ার মত অবস্থা ছিল না। কন্ট্রোল ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মজুতদারদের পোয়াবারো অবস্থা হয়েছিল। শোষণের নতুন রাস্তা খুলে গিয়েছিল। তখন মৃতের সৎকারের জন্যও প্রয়োজনীয় বস্ত্রের যোগান পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ সংকট ছিল মানুষের সৃষ্টি। কৃত্রিম সংকট তৈরী করে দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী ও মুনাফালোভীরা তাদের আখের গুছিয়েছে। 'বিধান পরিষদে অভিযোগ করা হয় যে, সরবরাহ মন্ত্রী বড়োবাজারের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে এই কৃত্রিম অভাব তৈরীর জন্য দায়ী। সরবরাহ মন্ত্রী এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। কেন্দ্রের উদ্যোগে বড়োবাজারের গুদাম খোঁজার ব্যবস্থা হয় ও তিনহাজার গুদাম সিল করা হয়। সুহরাওয়ার্দি কিল খেয়ে কিল হজম করতে বাধ্য হন।[১৮] এ অবস্থার এক বর্ণনা প্রকাশ পেয়েছে নিবারণ পণ্ডিতের এক গানে :.

ছিঁড়ে গেছে ক্ষীণ বসন
মিলেনা আর বস্ত্র নূতন
বাজার হইল আজব কারখানা
কাপড় দিয়া মৌতা এখন দাহ করা আর চলেনা॥
লবণ-কোরোসিন-চিনি
আধসের (আর) দেড় ছটাক কিনি
রেশন কার্ডে কাপড় পাওয়া যায় না–
এমনি করে আর বা কত থাকবে দেশ বসন বিনা॥

[নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ২৬]

মন্বন্তরের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে আবির্ভূত হ'ল মহামারী। আমাশয়, কলেরা, ম্যালেরিয়া ও জ্বর এই চারিটি রোগে আক্রান্ত হ'ল অনাহারী কুখাদ্য গ্রহণকারী নিরাশ্রয়ী লাখ লাখ মানুষ। কিন্তু তখন জীবন রক্ষাকারী ঔষধ নিয়েও চলছে মজুতদারী ও চোরাকারবারী। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মন্বন্তরের বছর যুদ্ধেরও বছর। সৈন্যদের জন্য কুইনাইন মজুত করার ফলে এই মৃত্যুহার এত বেশী। উল্লিখিত চারটি রোগে মৃত্যের সংখ্যা ১৯৪৩ সালে ৪,২৭২৮৭ এবং ১৯৪৪ সালে ৪,০০,৮৮৯।[১৯] এর মধ্যে ম্যালেরিয়াতে মৃতের সংখ্যা অর্ধেকের বেশী । এই অবস্থার করুণ বর্ণনা আছে একটি গানে :

আজও যারা যায়নি মরে
উঠতে নারে শয্যা ছেড়ে
ম্যালেরিয়া কালাজ্বরে হয়েছেরে জিতে মরা॥
এই দেশের সেই জেলে তাঁতী,
কাঁদে তারা দিবা রাতি
পায়না সূতা যন্ত্রপাতি ভাত বেগরে মরলো তারা॥
ঘুমটা দেওয়া বঙ্গনারী
পায়না ঘুমটা দেবার শাড়ী
লেংটা হ'ল বৌ ঝিয়াড়ী, হায় আজ দেহের এই চেহারা॥

[নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ৫৮]

ম্যালেরিয়া মহামারী আকার ধারণ করায় সেই সময় ময়মনসিংহে মানুষের যে অবর্ণনীয় সংকট তৈরী হয়েছিল আরো একটি গানে তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা ও কবির দরদী মনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে :

(আবার) এসেছে দারুণ কাল রোগ ম্যালেরিয়া—
কুইনাইন মিলেনা কোথাও ঘুরিয়া ঘুরিয়া
চিকিৎসা বিনে কত লোক মরে শত শত বস্ত্র ছাড়া শেষে হয় গোর কাফন॥

মরিছে ছলিমের মা রহিমের বউ
করিমের বাড়িতে আর বেঁচে নাই কেউ
কত রহিম করিম হায় ময়মনসিংহ জিলায় রাস্তায় রাস্তায় হয়েছেরে খুন॥

[নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ৩৪]

১৯৪৫ সালের মে মাসে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনায় নিখিল ভারত কৃষক সভার সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলন উপলক্ষে নিবারণ পণ্ডিত কয়েকটি গান রচনা করেন যার অন্যতম ছিল লবণ-বস্ত্র ও ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিষেধক কুইনাইনের সংকটের কারণে অগণিত মানুষের চরম ভোগান্তি ও মৃত্যুর প্রতিবাদে রচিত গান। সরকারের বিতর্কিত ভূমিকা ও সাধারণ মানুষদের বঞ্চিত করে ডিলারদের লবণ-চিনি-বস্ত্র ইত্যাদি সামগ্রীর মজুতদারী ও কালোবাজারী করার প্রতিবাদে এই গান রচিত হয়। সরকার এই মর্মে ফরমান জারী করেছিল, যে ট্যাক্স প্রদানকারী নয় সে কার্ড পাবেনা, ফলে কন্ট্রোলের মাল তার কপালে জুটবে না। আবার ভাগ্যবান যারা তারা রিলিফের কাপড়ে বালিশের কভার তৈরী করেছে অন্যদিকে লজ্জা নিবারণের জন্য কেউ এক টুকরো কাপড় পায়নি। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে তার লেখনী সর্বদাই সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছে :

মুখ চিনিয়া বিলি হইল কন্ট্রোলের কুইনাইন
টেক্স নাই যার কার্ড পাইবা না সাহীদারের আইন
রিলিফের কাপড়ে হইল বালিশের উসার
কেউ পায়না ছিঁড়া তেনা কেউ করে রে বাহার রে॥

তাই বলি ভাই চল সবাই হয়ে হুঁশিয়ার
সবে মিলে বন্ধ করি চোরাই কারবার
কন্ট্রোল দোকান আনি আমাদের হাতে
সবাই এসে যোগদান করুক আমাদের সাথে
কি কি জিনিষ নাই আমাদের কি কি জিনিস চাই
পূরণ করিতে দাবী আন্দোলন চালাই রে॥

[নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ৪৪-৪৫]

এই সম্মেলনের প্রচার কার্যেও অনেকগুলি গান রচনা করেন নিবারণ পণ্ডিত যেখানে বঞ্চনা-শোষণ জয়ে সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদী চেতনা নিয়ে সামনে এগোনোর মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে :

এক সাথে চল গড়বো মোরা রাঙ্গা দুনিয়া
সবে মিলে থাকবো মোরা বিভেদ ভুলিয়া
... ...
শ্রমিক কৃষক সবাই সমান সবার দুঃখ এক
এক অবস্থায় দেশবাসী পড়িছে অনেক
দুঃখ সহিয়াছি ঢের
ভয়-ভাবনা কিসের
আয়রে যত কৃষক শ্রমিক উঠরে জাগিয়া
উঠরে জাগিয়া॥

[নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ৪২]

(৪) কৃষক আন্দোলনের গান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে তিনদফায় ময়মনসিংহে টংক প্রথা বিরোধী আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন বামপন্থী নেতা মনি সিংহ, আলতাফ আলি, ললিত সরকার প্রমুখ। ১৯৩৮ সালে প্রথম টংক বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধে, কিন্তু তারপর বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে এই আন্দোলন গতি হারায় কারণ আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী কমিউনিষ্ট পার্টি তখন ফ্যাসিবাদ বিরোধী জোট গঠন করে আন্দোলন চালাচ্ছিল। যুদ্ধের মাঝেই দুর্ভিক্ষ শুরু হলে লঙ্গরখানা খোলা ও পরিচালনাতে পার্টির শক্তি নিয়োজিত থাকে। ফলে এই আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। যুদ্ধ শেষ হলে ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় দফা ও দেশভাগের পর ১৯৪৮ সালে শেষ দফা টংক আন্দোলন পরিচালিত হয়। টংক প্রথা হলো টাকায় খাজনা পরিশোধ না করে ধানে পরিশোধ করা এবং টংকের হার ছিল সোয়া একরে ৭–১৫ মন পর্যন্ত। আবার সেরের ওজন ছিল ৮৫ তোলা ১০০ তোলা। তবে সাধারণতঃ ৯০ তোলাতে খাজনা নেওয়া হত। কিন্তু খাজনা নেওয়ার সময় জমিদার বাড়িতে ভয়াবহ কারচুপি করা হত। আর তা নিরক্ষর কৃষকরা বুঝতে পারতো না। এক সময় জমিদাররা ১০০ তোলায় খাজনা আদায়ের নির্দেশ দিলে কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। সেই ক্ষোভ থেকেই টংক আন্দোলনের সূত্রপাত। এই আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী কমরেড মনি সিংহের ভূমিকা নিয়ে নিবারণ পণ্ডিত বেশ কয়েকটি অসাধারণ গান রচনা করেছেন। যেমন :

শুনেন যত দেশবাসী শুনেন গরীব চাষী শুনেন সর্বজন
কৃষক দরদী মনি সিংহের বিবরণ
সংক্ষেপেতে দুই এক কথা হে করিব বর্ণন॥

একদিন মনি আচম্বিত দেখে সুসং রাজবাড়িতে হাজং বহুলোক
জঙ্গী চেহারা তাদের ভয়ে ভয়ে ভীতু মুখ
কারণ জানিতে মনি হে হইল উৎসুক॥
ডাকি এক হাজং এরে মনি নিয়া কিছুদূরে জিজ্ঞাসে কারণ
কি কারণে তোমাদের ভয়ে ভীতু মন
বিস্তারিয়া কহ শুনি হে সব বিবরণ॥
হাজংটি কাদিয়া বলে শুন বাবু তাহা হলে (আমরা) দোষী সর্বজন।
ধান আনিয়াছিলাম নব্বুইয়ে ওজন
একশ তোলায় সের দিতে হে কয় পেয়াদাগণ॥
নব্বই তোলাতে সের, ধান দেই টংকের জানি সর্বদায়
এখন সের দিতে কয় একশ তোলায়
এই দোষে হইয়াছি দোষী হে ছাড়েনা পেয়াদায়॥
আসিয়াছি কোন্ সকালে ক্ষুধায় এখন পেট জ্বলে পাইনা বিদায়
বিকালে আসিবেন বাবু বাহির আঙ্গিনায়
পেয়াদারা জানাইয়া গেল হে কর্কশ ভাষায়॥
হাজং এর কথা শুনি অবাক হইয়া বলে মনি হবে প্রতিকার
রক্ষা করব তোমাদের প্রতিজ্ঞা আমার–
বন্ধ করব জুলুমবাজি হে অন্যায় অবিচার॥
মনি আপন জমিবাড়ি সমিতিতে দানকরি করেন আবেদন
কে কে হবে কৃষককর্মী বলো এইক্ষণ
সংগ্রাম চালাইতে হবে হে জীবন-মরণ॥
তারপরে এক সভা হলো নিয়া হাজং কোচ ডালো যতেক কিষাণ
গাড়ো বানাই ছেলে মেয়ে হিন্দু-মুসলমান
সবাইরে চিনাইল মণি হে রক্ত নিশান॥
ললিত হান্নানের মত কর্মী এলো শত শত ফৌজি দশ হাজার
মেয়েরা আসিল সেজে কয়েক হাজার
টংক প্রথাটি শেষে হইল চুরমার।

[নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ৪৭]

টংক আন্দোলন ও হাজং বিদ্রোহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। মূলত ঃ ১২৮০ সালে ময়মনসিংহের সুসং রাজ্যের গোড়াপত্তনের পর আসাম থেকে হাজং উপজাতিদের আমদানী করা হয়। তাছাড়া আগে থেকেই সেখানে ডালু, কোচ, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি উপজাতিরা বসবাস করতো। প্রথমদিকে এদের কোন খাজনা ছিলনা কারণ গারো পাহাড় থেকে তাদের এতই আয় হতো যে, সমতল ভূমির আয়ের প্রতি তাদের কোন নজর ছিলনা। গারো পাহাড়ে ছিল কাঠ, কয়লা, বাঁশ, আগর ও নানা খনিজ পদার্থ। তাছাড়া হাতি ধরার মত লাভজনক বিষয়ও ছিল। কিন্তু ১৮৮৫ সালে **গারো হিলস্** এ্যাক্ট জারির মাধ্যমে বৃটিশ সরকার গারো পাহাড় নিজেদের করায়ত্ত করে। ফলে জমিদারদের মূল আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়। তবে কিছুদিন হাতি ধরার অধিকার বলবৎ ছিল। পরে তাও বৃটিশ সরকার বন্ধ করে দেয়। তখন ১৮৯০ সালে জমিদাররা হাজংদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে হাশমীর বর্ণনায় পাই :

> After the passing of the Garo Hills Act in late Nineteenth century the tribal peasants were subjected to the local Zaminders, who compelled them to pay a fixed amount of rental in kind irrespective of the yield. The system known as tanka or dhan karani was more exacting than the barga or crop sharing system. [২০]

এই একই প্রসঙ্গে মনি সিংহ তার জীবন সংগ্রাম গ্রন্থে বলেছেন :

> সুসং জমিদাররা গারো জমিদাররা গারো পাহাড়ের অধিকার হ'তে বঞ্চিত হয়ে মনে হয় এই প্রথা প্রবর্তন করেন। জোত স্বত্বের জমির বন্দোবস্ত নিতে হলে প্রতি সোয়া একরে একশত টাকা থেকে দুইশত টাকা নজরানা দিতে হয়। গরীব কৃষক ওই নজরানার টাকা সংগ্রহ করতে সমর্থ ছিলেন না। টংক প্রথায় কোন নজরানা লাগতো না। কাজেই গরীব কৃষকের পক্ষে টংক নেওয়াই ছিল সুবিধা জনক। টংকের হার প্রথমে এত বেশী ছিলনা। কৃষকরা যখন টংক জমি নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসলেন, তখন ঐসব জমির হার নিলামে ডাকা হ'ত। ফলে হার ক্রমে বেড়ে যায়। যে কৃষক বেশী ধান দিতে কবুল করত তাকেই অর্থাৎ পূর্বতন বেশী ডাককারী কৃষকের নিকট থেকে জমি ছাড়িয়ে হস্তান্তর করা হ'ত। এই ভাবে নিলামে ডাক বেড়ে গিয়ে ১৯৩৭ সাল থেকে হার সোয়া একরে পনের মন পর্যন্ত উঠে যায়।[২১]

কিন্তু এক পর্যায়ে হাজংরা খাজনা দিতে অস্বীকৃতি জানালে জমিদারদের সাথে তাদের বিরোধের সূত্রপাত হয়। হাজংরা রীতিমত বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। জমিদাররা বল প্রয়োগে বিরোধ দমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সফল হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে এই বিদ্রোহ দমন হলেও ১৯৩৮ সালে প্রথম দফা টংক আন্দোলন শুরু হলে হাজংরা আবার ওই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বৃটিশ সরকার এই আন্দোলনের মুখে গারো পাহাড় অঞ্চলে জরিপ চালিয়ে একর প্রতি উৎপাদনের হিসাব সংগ্রহ করে টংক প্রথার কিঞ্চিত সংশোধন করে। এই সংশোধিত পদ্ধতির প্রবর্তন হয় ১৯৪০ সালে। সংশোধনীটি কেমন ছিল তার বর্ণনা পাই Peasant movements in Bengal and Bihar গ্রন্থে—

> After a long sustained agitation by the tanka peasants, the fazlul Haq ministry, at least, in 1940 intervened though haltingly and half heartedly. The Government made a survey of the entire lands of those five police stations of Kalmakanda, Durgapur, Haluaghat, Naltabari, Sribordi and announced that (1) peasants would have 'Jot' rights in the Tanka land (2) if he tilled a land for 12 years he would not pay any 'salami' and (3) peasants tilling a land for less than 12 years would pay "salami' worth one year Tanka-paddy and this would be paid in instalments in nine years. The main demand of money rent in place of Tanka was not granted. Government would not abolish Tanka. [২২]

গানটির শেষ লাইনে যদিও বলা হচ্ছে টংক প্রথাটি চুরমার হয়ে গেল, আসলে প্রথাটি সংশোধনের মাধ্যমে রয়েই গেল। তাই ১৯৪৩ সালে প্রাদেশিক কৃষক সম্মিলনে ও পরবর্তীকালে ১৯৪৫ সালে নেত্রকোনায় নিখিল ভারত কৃষক সম্মিলনে টংক প্রথার পরিপূর্ণ উচ্ছেদ দাবী করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এরপর দ্বিতীয় দফা টংক আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৬ সালে। মাঝখানটায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। সে সময় টংক আন্দোলন হয়নি বলা চলে। কিন্তু এ দফায় আন্দোলন শুরু করে তাতেও সফলতা লাভ করা গেল না। যেটুকু সংস্কার হয়েছিল

তাই রয়ে গেল। তবে এই সময় যে আন্দোলনটি শুরু হয়ে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে তা তে-ভাগা আন্দোলন। উৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের দুইভাগ বর্গাচাষীদের প্রাপ্য-এই দাবীকে সামনে রেখেই এই আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। রংপুর, ময়মনসিংহ, যশোর, খুলনা, হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া, মালদহ, নদীয়া চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর ও জলপাইগুড়িতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৪৬ সালেরই মাঝামাঝি সময় লেঙ্গুরা বাজার লুট করতে আসে জমিদারদের পেটোয়া বাহিনী। এই বাজারটি অতি প্রাচীন এবং এর তিন চতুরাংশের মালিক ছিল একজন হাজং কৃষক আর বাকিটার মালিকানা ছিল সুসং জামিদারদের। কিন্তু জামিদারদের মদদে এই বাজারের উত্তর দিক ঘেঁষেই আর একটি নতুন বাজার স্থাপন করা হ'ল। কিন্তু মনি সিংহ, আলতাফ আলি প্রমুখের নেতৃত্বে আবার পুরানো বাজার চালু হলে জামিদারদের লাঠিয়াল বাহিনী তা ভেঙ্গে দিতে আসে। নেতাদের প্রতিরোধের মুখে তারা সাময়িক ফিরে গেলেও জমিদারদের কাচারি থেকে সশস্ত্র পুলিশ এসে নেতাদের ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু এই খবর ছড়িয়ে পড়লে চারিদিক থেকে শত শত লোক ঢাল-সড়কি-বল্লম নিয়ে বাজারের দিকে এগিয়ে আসে। সেই উত্তেজিত জনতাকে সামলানো পুলিশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরে মনি সিংহ ও অন্যান্যরা তাদেরকে নিরস্ত্র করেন। এই বিষয়টি নিবারণ পণ্ডিত তার এক গানে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন :

ময়মনসিংহ জিলাতে মোদের লেংগুড়া বাজারে
বাজার ভাইঙা নিতে আইল সুসুং জমিদারে
সেই গোল ভাঙ্গাতে গিয়েছিল কৃষক নেতাগণ
মনি সিংহ আর আলতাব আলি আরও কয়েকজন।
তাদের মাথায় দিল বারি পুলিশ গুণ্ডার দলে।
জোর করিয়া ধইরা নিল কাছারি মহলে
শুইন্যা দেশের পুরুষ নারী হাজারে হাজারে
লাঠি-সোটা নিয়ে গেল লেংগুড়া বাজারে।
বলছে সবাই করবো লড়াই কেহ না ফিরিব
প্রাণ দিতে হয় দিব মোরা প্রতিশোধ তার নিব
ভয় পাইল গুণ্ডার দল আর পুলিশ নায়েব যত

তারা কৃষক নেতা মনি সিংহের হইল পদানত।
ক্ষমা ভিক্ষা চাইল তারা সকলে মিলিয়া
ফিরে গেল জনতা সব নেতার কথা শুনিয়া
শুনরে ও ভাই কৃষক যত হওরে হুশিয়ার
এমন লীলা নাইরে কিন্তু সারা দুনিয়ায়।

{নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ৪৯

১৯৪৮ সালে শেষদফা টংক আন্দোলন হয়। এইসময় বেশকিছু বিচ্ছিন্ন সশস্ত্র আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের ঘটনা ঘটে। পরে ১৯৪৯ সালে লেঙ্গুড়া বাজারে সবচেয়ে বড় পুলিশ হামলাটি হল। এই হামলায় দু'দফায় শহীদ হন মঙ্গল সরকার, আগেন্দ্র, সুরেন্দ্র, রাশমনি, শঙ্খমনি, রেবতী, যোগেন, স্বরাজ প্রমুখ প্রায় ১৯ জন। এই ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় মনি সিংহের জীবনী গ্রন্থে :

> ১৯৪৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মঙ্গল সরকারের নেতৃত্বে একদল ভলান্টিয়ার লেঙ্গুরা হাটের দিন প্রচারের কাজে সেখানে গিয়ে হাজির হল। সেখানে অবাঙ্গালি সশস্ত্র পুলিশের ক্যাম্প ছিল। তারা সংখ্যায় ছিল পঁচিশ-ত্রিশজনের মত। মঙ্গল সরকারের দল যখন শ্লোগান দিল 'টংক প্রথার উচ্ছেদ চাই, বিনা খেসারাতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ কর,' তখন ঐ ক্যাম্পের পুলিশরা কোনরূপ সতর্কতা ঘোষণা না করেই ভলান্টিয়ার দলের উপর নৃসংশভাবে গুলি চালায়। ফলে মঙ্গল সরকার, অগেন্দ্র ও সূরেন্দ্র ঘটনাস্থলেই শহীদ হলেন। এই সংবাদ যখন গ্রামে পৌছলো তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবাল-বৃদ্ধ বণিতা- যে যা হাতের কাছে পেল তাই নিয়ে হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অগ্রসর হলো। তারা এতখানি উত্তেজিত হয়েছিল যে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনার কোন অবস্থা ছিল না। কিন্তু ত্রিশটি রাইফেল হাতে অনবরত গুলি বর্ষণ হতে থাকলো। তখন তারা শয়ে পড়ে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে তাদের অভিযান টিকল না। আরো ১৬ জন মেয়ে পুরুষ গুলিতে নিহত হ'ল। শঙ্খমনি, রেবতি যোগেন, স্বরাজ প্রমুখ মোট ১৯জন শহীদ হলেন।[২৩]

এতকিছুর পরও টংক আন্দোলনে পরিপূর্ণ বিজয় অর্জিত হ'লনা। আংশিক পরিবর্তনের মাধ্যমে যে আইনটি ১৯৪০ সালে জারি হয়েছিল তা-ই রয়ে গেল। তবে কৃষক সমাজের ন্যায্য দাবী আদায়ের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলনে নৈতিক সমর্থন দানের লক্ষ্যে রচিত গানে নিবারণ পণ্ডিতের প্রতিবাদী মানসিকতার পরিচয় খুঁজে পাই। এই চেতনাই তার গানের মূল বস্তু।

(৫) শরণার্থীদের দুর্দশা বর্ণনায় রচিত গান :

ভারতের স্বাধীনতা (১৯৪৭) লাভের পর মানুষের স্বপ্ন ভেঙ্গে যেতে সময় লাগেনি। একটি অবিমৃশ্যকারী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দ্বারা দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মানুষের দুই অংশে বসবাসের যে ফরমান জারি হয়েছিল তাতে গভীর উদ্বাস্তু সমস্যা তৈরী হয়েছিল। শুধুমাত্র ভবিষ্যতে নিরাপত্তার সাথে বসবাসের আশায় দুই অংশ থেকেই মানুষ সাত-পুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে আশ্রয় খুঁজে পেতে নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে পাড়ি জমাতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তারা জানতো না যে, সামনে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল উদ্বাস্তু শিবিরের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। তৎকালীন পূর্ববাংলা থেকে হিন্দুদের দেশত্যাগ ঘটতে থাকে নোয়াখারী দাঙ্গার পর। অক্টোবরের প্রথম ভাগে দাঙ্গার পর কোলকাতা ও আগরতলায় শরণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০,০০০। একই মাসের শেষভাগে বিহারের দাঙ্গার পর মুসিলম শরণার্থীরা ভিড় জমাতে থাকে পাটনায় যার সংখ্যা ২৫,০০০-এর মত। এরপর দেশ ভাগ হলে শরণার্থীদের ক্রমাগত চাপ বাড়তেই থাকে। তবে অত্যাচার, নিপীড়ন, জবরদখল ছাড়াও 'প্রথম পর্বে (১৯৪৮–৪৯) পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের চলে আসার প্রধান কারণটি ছিল তাদের মনস্তাত্ত্বিক সংকট। হিন্দুরা, বিশেষত অবস্থাপন্ন হিন্দুরা, কিছুতেই পাকিস্তানকে মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না। বংশ পরম্পরায় পূর্ববঙ্গে তাঁরা জমি ভোগ করেছেন, সামাজিক মর্যাদা পেয়েছেন; এখন তারা অনুভব করছিলেন দেশটার অধিকার আর তাদের হাতে রইল না, দেশটা অন্যের হয়ে গেল; নিজভূমে তাঁরা পরবাসী হয়ে গেলেন।[২৪] তবে অবস্থাপন্ন হিন্দুরা চলে গেলে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হিন্দুরাও চলে যাবার তাগিদ অনুভব করেন কারণ এখানে আর তাদের কোন কাজ ছিলনা। 'অবস্থাপন্ন হিন্দুরাই আগে চলে আসেন; কারণ অভিমানজাত মনস্তাত্ত্বিক সংকট তাদের মধ্যেই বেশী ছিল। তাদের দেখাদেখি, নিরাপত্তাহীনতার আতঙ্ক এবং আর্থিক অনিশ্চয়তার কারণে অন্যান্য শ্রেণীর মানুষজনও দেশ ছাড়তে শুরু করেন।[২৫] প্রথম দিকে যারা দেশ ত্যাগ করেনি তাদের অবস্থা পরে খুবই খারাপ হয়েছিল। নিবারণ পণ্ডিতের নিজেরই শরণার্থী শিবিরের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। ১৯৫০ সালে দেশ ত্যাগ

করে যখন আলিপুর দুয়ারায় যান তখন পরিবারের নয়জন সদস্য-সদস্যাসহ সেখানকার অমানবিক পরিবেশে বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা মাঝে মাঝেই ফিরে এসেছে তার রচনায়। এই সব অভিজ্ঞতা নিয়ে শুধু গানই নয় 'বাস্তুহারার মরণকান্না' শিরোনামে পুস্তিকাও রচনা করেছেন তিনি। স্বাধীনতার পর স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে এই গানটিতে :

শুন শুন শুন ভাইরে শুন দিয়া মন
স্বরাজ মাহাত্ম্য কিছু করিব বর্ণন
স্বাধীন হইয়া পাইলাম আমরা প্রথম পুরস্কার
রিফিউজি এক ইংরেজি নাম(তার) অতি চমৎকার॥

....

ইস্টিসনে গাছতলা আর ফুটপাতে পড়িয়া
আমার মাবোন নিদ্রা যায় ছিড়া তেনায় শুইয়া
ডেরা বান্ধলেও হইতে হয় বুলেটের শিকার
সাক্ষী আছে বীণাপানি আর পরেশ সরকার।

স্বাধীন হইয়া আমরা ভাইরে ভাব্যছিলাম সবে
মোটা ভাত মোটা কাপড় এইবার মিলিবে
খাদ্য চাইলে কি মিলে ভাই শুন সমাচার
সাক্ষী দিবে দ্বার ভাঙ্গা আর রাঙ্গা কুচবিহার॥

জমিদার উঠলনা ভাই উচ্ছেদ হইলাম মোরা
জমি চাইয়া স্বাধীন দেশে হইলাম ভিটা হারা
মুছে তা দেয় কলোনি করে কত জমিদার
তেলুয়া মাথায় তেল চপাচপ আমরা আড্ডিসার॥

{নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ৬৯}

গানটিতে যে বর্ণনা আছে তার সবই সত্য। 'কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন বাস্তুহারা মানুষের ভিড়ে ভরে যায় এই সময়।'[২৬] কলেরার টিকা ও পুনর্বাসন দপ্তরের প্রত্যয়ন নিয়ে সবাইকে যেতে হতো শিবিরে। বাকী সময় দড়ি দিয়ে ঘিরে

রাখা স্থানে গাদাগাদি অবস্থায় যৎসামান্য চিড়ে-গুড় ও দিনে দু'টাকা বরাদ্দ নিয়ে জীবন চালাতে হচ্ছিল। পানীয় জলের অভাব শৌচাগারের শোচনীয় অবস্থার মধ্যে ডায়রিয়া-কলেরা-ইনফ্লুয়েঞ্জার অবাধ আক্রমণ ঘটে। ১৯৪৯ সালে নেহরু বারাকপুরে এলে উদ্বাস্তুরা মিছিল করে তাদের দাবী-দাওয়া পেশ করতে গেলে পুলিশ বাঁধা দেয়। তারা বাঁধা পেরুতে গেলে পুলিশ লাঠি ও টিয়ার গ্যাস চালায়। ফলে নারীসহ কয়েকজন আহত হন। এর প্রতিবাদে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বামপন্থী ছাত্ররা সভা আয়োজন করে। প্রতিবাদ সভাশেষে মিছিল ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে চাইলে পুলিশ মিছিলে গুলি চালিয়ে ৪জন ছাত্রকে হত্যা করে। 'উদ্বাস্তুদের উপর পুলিশের গুলি চালনার ঘটনা এই একমাত্র নয়; ১৯৫০-র পরে ধুবুলিয়া ক্যাম্পের একটি ঘটনায় পুলিশের গুলিতে ১জন নিহত হয়েছিলেন।'[২৭] প্রত্যক্ষভাবে এই সব ঘটনাগুলো উল্লিখিত গানটিতে উঠে এসেছে।

দেশভাগ এক অমানবিক বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের জন্য বৃহৎ দুই সম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর ব্যর্থ নেতৃত্ব দায়ী। তাদর রাজনৈতিক স্বার্থের মধ্যে অন্ততঃ সাধারণ মানুষের মঙ্গলচিন্তার কোনস্থান ছিল না। দুর্বৃত্তের হাতে প্রতিনিয়ত মানবতা লাঞ্ছিত হয়েছে কিন্তু তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তা প্রতিরোধে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। 'একটা বিরাট দেশ দ্বিখন্ডিত হয়েছে" মানুষের হৃদয় ভেঙ্গে গেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন, হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, নির্যাতিতা হয়েছেন অসংখ্য নারী। শুধু সংখ্যাগত হিসেব দিয়ে এই মানব বিপর্যয়কে বোঝা যাবে না।[২৮] দেশ বিভাগের পরও ধারাবাহিক চলে আসতে থাকা দাঙ্গার রেশ কিছুমাত্র কমার লক্ষণ দেখা গেলনা। বরং হঠাৎ করেই পঞ্চাশের জানুয়ারীতে ফের দাঙ্গা বেধে গেল। এই পর্যায়ে খুলনা-বরিশাল-ফরিদপুর-ঢাকাসহ প্রায় বারোটি জেলায় হিন্দুবিরোধী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। এর ফলাফল কত ভয়ংকর হয়েছিল তার বর্ণনা পাই সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের রচনায় :

> এই দাঙ্গার ধাক্কায় প্রায় ৩৫ লাখ হিন্দু চলে এল পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরায় এবং অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকা ও কাছাড় জেলায়। প্রতিহিংসামূলক দাঙ্গায় বিপন্ন হল পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলের কাছাকাছি জেলার মুসলমানেরা। বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের সম্পৃক্ত সমাজ জীবনকে এরকম বড় আঘাত দেশবিভাগও দিতে পারেনি। এই দাঙ্গা

পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা প্রায় ত্রিশলাখ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালির জীবনবোধ, মমত্ব দায়ভাগ ও মূল্যবোধকে একেবারে ওলটপালট করে দিল। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এক নতুন প্রজন্ম দেখা দিল যাদের জন্ম রেললাইনের পাশে জবরদখল জমির কুঁড়ে ঘরে এমনকী রেলগাড়ির পরিত্যক্ত কামরায়। শিয়ালদা ষ্টেশনের ৭৫/৮০ মাইলের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা ধুবুলিয়া, বাদকুল্লা, রূপশ্রী, কুপার্সাক্যাম্প, তাহেরপুর, রাণাঘাট, ঘোলা প্রভৃতি শরণার্থী শিবিরের মেয়েদের দেখা যেতে লাগল সন্ধ্যার অন্ধকারে ধর্মতলা, চৌরঙ্গী, এসপ্লানেডের মোড়ে। পাওয়া যেতে লাগল কলকাতার পতিতলয়গুলিতে 'বাঙাল' উচ্চারণভঙ্গির মেয়েদের অস্তিত্ব। শুধু বেঁচে থাকা, ভাইবোন ও বৃদ্ধ মা বাপের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নিজেদের মানুষের ভগ্নাংশের পরিণত করা। সীমান্ত শহর বনগাঁর লাখ লাখ শরণার্থীদের মাঝে ওই সময় জীবনের এই অবনমনের কথা মনে রেখে জওহরলাল নেহরুকে বলতে হয়েছিল। Partition of the country brought many evils at its train...'[২৯]

শরণার্থী শিবিরের সেই বেদনাঘন কাহিনী নিবারণ পণ্ডিত তার গানের মাধ্যমে তুলে এনে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মানবাত্মার লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তার লেখনী সর্বদাই ছিল সোচ্চার।

শানস শোষণ তা দেশী-বিদেশী যে শোষকের হাতেই হোকনা কেন শোষিতের যন্ত্রণা একই রকম। কোন মৌলিক পার্থক্য তাতে লক্ষ্য করা যায় না। এখানে আরো একবার আমরা সেই সত্য উপলব্ধি করতে পারি। অন্য একটি গানেও তিনি দেশী শোষকদের ইংরেজ শোষকদের প্রেতাত্মা রূপেই দেখেছেন। তাই বাঁচবার অধিকার আদায়ে সমবেত হওয়ার জন্য আওয়াজ তুলেছেন :

মিলে মজুর চাষী মধ্যবিত্ত
আনতে হবে বাঁচার অধিকার
চল সবে মিলে এক হয়ে আজ পথ ধরিরে বাঁচিবার।
ভূতের গোষ্ঠী যায়নি ছেড়ে, আছে তোমার আমার ঘরে

লক্ষ্য করে দেখরে একবার–
দেখ ধলা ভূতের কালো চেহারারে ওরে আমার দেশবাসী ভাই
পরেক্ষে থাকিয়ারে ভূতে করতেছে ভূতের কারবার।

ভূতে ধরা ভাঙ্গাবাড়ি চল ভাই মেরামত করি
নতুন সাজে হইবে তৈয়ার–
দাও ভাঙ্গা চালে নূতন ছাউনিরে ওরে আমার দেশবাসী ভাই
নতুন গান কণ্ঠে ধর, গঠন কর নতুন সংসার॥

[নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ৩]

মালিক- জোতদার-জমিদার শ্রেণীর শোষণ ও মুনাফা শিকারে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে প্রতিবাদী চেতনা জাগাতে তিনি লিখেছেন :

ভাঙ্গরে ভাঙ্গ ভাঙ্গরে ভাঙ্গ
ভাঙ্গরে ভাঙ্গ যত চোরের বাসা
ও গরীব ভাইরে চাষী মজুর ভাইরে
নইলেতো নাই কারো ভাই বাঁচিবার আশা॥

স্বদেশী বিদেশী কারখানার মালিক
মজুর মেরে রাখে মুনাফা ঠিক
সবাই মিলে কর এদের কোণঠাসা॥

গ্রামের অধিবাসী রয়যে উপবাসী
চোরগুলো যদি রাজা হয় বসি
সবাই মিলে কারো এদের কোণঠাসা॥

[নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ৬৫]

একই চেতনা ধরা পড়েছে তার আরো একটি গানে :

কি আছে তোর ভয় ডর
বাঁচির বাদে লড়াই কররে
মরবি যদি মরি যা তুই বাঁচার লড়াই করিয়া॥

যাঁয় তোমাকে নিত্তি মারে
মুখের গ্রাস হরণ করে
মূল দুষমনক্ বিনাশ কর তুই মরণ কামড় দিয়া॥

[নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ১০৩]

(৬) যুদ্ধ-বিরোধী চেতনার গান :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ১৯৪২ সালের শেষদিকে চট্টগ্রাম, মনিপুর ও আসামে জাপানীরা বোমা ফেলে, কলকাতায় ফেলে ২০ ডিসেম্বর। এর প্রতিবাদে নিবারণ পণ্ডিত রচনা করেন প্রতিবাদী গান :

ওরে আসাম মনিপুরে
দিবারাত্রি ঘর্ঘর শব্দ ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান উড়ে।
চতুষ্পার্শে আছে যারা, মৃতুপ্রায় হইয়াছে তারা
সদায় এই চিন্তাধারা কখন বোমা পড়ে–
দরদী কেউ নাইকো তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করে
আপন বুচকা বান্ধে সবাই আপন আপন চিন্তা করে॥

[নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ১৭]

১৯৫০ সালের ২৫ জুন আমেরিকা-উত্তর কোরিয়া যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নিবারণ পণ্ডিত এই গানটি রচনা করেন। ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়া দখল করে নেয়। এরপর বিশ্বযুদ্ধের পর কোরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে তবে ভারতের মত দু'ভাগ হয়ে। যুদ্ধের পর 'ফ্যাসিস্ট চক্রের পদানত দেশগুলো স্ব স্ব ভাগ্য নিজেরা নির্ধারণ করতে এগিয়ে আসে। এ সব শক্তির সহায়তায় তাদের আদর্শের বিপরীতমুখিতার কারণে তা জার্মানীর ক্ষেত্রে বিভক্তি টেনে এনেছিল। কোরিয়ার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।'[৩০] ১৯৫০ সালে দুই কোরিয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। 'দক্ষিণ

কোরিয়াকে কমিউনিস্ট আগ্রাসন থেকে বাঁচার জন্য জাতিসংঘের নাম করে সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৈন্য পাঠায়। এই যুদ্ধ কার্যত অমিমাংসিতভাবে শেষ হয়।'[৩১] পৃথিবী যে মূলত : দুই ধারায় বিভক্ত– শোষক আর শোষিত -এই সত্য উপলব্ধি থেকে তিনি আমেরিকা কর্তৃক জাতিসংঘের দোহাই দিয়ে কোরিয়ায় আগ্রাসনের প্রতিবাদে রচনা করেন এই গান :

দুনিয়ায়ার মানুষ যত, হয়েছে দ্বিভাগ বিভক্ত
শোষক দল আর শোষিত উভয়ে ঝগড়া
জোর জুলুমে ভাণ্ডার ভরা যাদের নীতিধারা
সে নীতি আজ মোড় ঘুরেছে শোষিত দিয়েছে সাড়া॥

কোরিয়ায় দেখরে ও ভাই, চলছে দুই নীতির লড়াই
কোরিয়ান আর আমেরিকান হইতেছে মহড়া
দুই নীতিতে চলছে দ্বন্দ্ব, হচ্ছে বুঝাপড়া
মধ্যপন্থা সেখানেই নাই, নিরপেক্ষ যায় আগে মারা

অশান্তি আর সইতে নারি, চল শান্তির পথ সন্ধান করি
মানুষকে রক্ষা করি, মানুষ হই আমরা
কুশাসনে মরছে মানুষ নাই তার কূল-কিনারা
মানুষে মানুষ মারে, এই কিরে মানুষের ধারা॥

[নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ৭১]

(৭) নীল বিদ্রোহের গান :

এদেশের শোষিত কৃষক শ্রেণীর জন্য সবসময়ই তার দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। নীল বিদ্রোহের জারিগানে নীলচাষের জন্য জমিদার ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ চাষীকুলের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। বৃটিশ আমলের সময় সারাটা বছর জুড়েই চাষ চলতো। জবরদস্তি করে সাহেবরা উর্বর

জমিগুলোতে নীল চাষ করতে কৃষদের বাধ্য করতো। কেউ অবাধ্য হলেই কুঠিতে আটকে চালাতো নির্মম অত্যাচার। বাধ্যতামূলক দাদন দিয়ে চাষ নীল করানো হতো। দাদন শেষ হলেও সাহেবদের খাতায় তাদের নাম থেকে যেত। আদালতে নালিশ করেও কোন লাভ হতো না। রায় সাহেবদের পক্ষেই যেত। অত্যাচারিত চাষীকূল একসময় সংগঠিত হয়ে বিদ্রোহ করলো। রংপুর, পাবনা, নাটোর, যশোর, দিনাজপুর, নদীয়া, মালদহ, ময়মনসিংহ সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়লো। এই নীল বিদ্রোহের কথা তার জারি গানে প্রকাশ পেয়েছে :

হায় হায়রে
কোম্পানীর আমলে নীল সাহেবগুলো এলো
নীল চাষীদের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাইল
সেই আগুনে পুড়ে দেশটা হইল অঙ্গার
ছারখার হইল কত সুখের সংসার॥

হায়রে হায়রে
ভালো জমি নীলকরেরা কিনিয়া লইল
জমি কিনে নীলের আবাদ আরম্ভ করিল
চলাফেরা করা চাষির হইল ভীষণ দায়
যারে পায় তারে ধরে কুঠিতে আটকায়॥

হায় হায়রে
দাদনের প্রথা একটা হইল বাহির
চাষীদের মারিবার অন্য আর একটি ফিকির
দাদন একবার নিলেরে আর শোধবার নাই উপায়
শোধ করলেও নাম থেকে যায় সাহেবদের খাতায়॥

হায় হায়রে
দাদন যদি না নিতে চাও তাহলে কি হবে
জোর জবরে সাহেবরা টিপসই রাখি দিবে
স্বীকার যদি না করে হায় পাবে না নিস্তার
আদালত কোন কথা শুনবে না তোমার॥

...
হায় হায়রে
অত্যাচারের ফলে চাষী ক্ষেপিয়া উঠিল
জেলায় জেলায় চাষীরা সব জমায়েত হইল
লক্ষ লক্ষ চাষী মিলে করলো অঙ্গীকার
ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে কুঠি, ভেঙ্গেছে এবার॥

হায় হায়রে
ময়মসিংহ, রংপুর, পাবনা, নাটোর, যশোহর
দিনাজপুর, নদীয়া মালদা হইল অগ্রসর
লোকে হইল লোকারণ্য মুখে মার মার
একদিনে সব নীলের কুঠি করিল চুরমার॥

[নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ৮২-৮৩-৮৪]

ভারতে নীলবাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে ১৭৭৯ সালে এবং তা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে। এই সময় থেকে ১৭৮৮ সাল পর্যন্ত কোম্পানী বেশ কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেও ব্যবসায় তেমন সুবিধা করতে পারেনি। পরে ১৭৯৬ সালে গভর্নর জেনারেল জন শোর কোলকাতা থেকে রপ্তানীযোগ্য নীলের মানোন্নয়ন ও বাংলায় নীলশিল্প জোরদার করার লক্ষ্যে অত্যন্ত কার্যকর এক ব্যবস্থা নেন।'[৩২] তার প্রচেষ্টায় বাংলায় নীলশিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তারপরও এ শিল্পের মঙ্গলজনক কোন ভবিষ্যত ছিলনা কারণ শুরু থেকেই তাদের শোষণ মনোবৃত্তির কারণে নীলকর সাহেবদের সাথে ভূমি মালিকদের বিরোধ ছিল। এই বিরোধের কারণ সম্পর্কে ব্লেয়ার বি কিং বলেছেন :

> ১৮২৯ সাল পর্যন্ত সরকারী নিষেধাজ্ঞার কারণে ইউরোপীয় নীলকররা তাদের কারখানার একেবারে পাশাপাশি কোন জমি কিনতে পারেনি বা ইজারাও নিতে পারেনি। নিজের জমিতে ভাড়া করা ক্ষেতমজুর দিয়ে নীলচাষের পরিবর্তে নীলকররা কারখানার নিকটস্থ চাষীদের দাদন দিয়ে রায়ত হিসেবে নীলচাষে প্রলুব্ধ করতে বাধ্য হতো। দাদন পুষিয়ে নেওয়া এবং রায়তদের কাছ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে কাঁচামাল সংগ্রহ করা ছিল নীলকরদের জন্য নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত এক সমস্যা এবং এই বিষয়টিই তাদেরকে স্থানীয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিরন্তর সংঘাতে জড়িয়ে ফেলে।[৩৩]

তাছাড়া জমি ইজারা দেওয়ার এবং খাজনা আদায়ের অনুমতি তাদের ছিল। কোন প্রজা নীল চাষে আপত্তি জানালে 'তারা ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন (১০ম আইন) প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত যেটা করতে পারতো- সেটা হলো খাজনা অনাদায়ের কারণে রায়তকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা (কিছু আবাসিক রায়ত অবশ্য কাগজে কলমে এই উচ্ছেদের আওতায় পড়তো না, কিন্তু যদি মনে করা হতো যে, তাদের বর্তমান খাজনার হার সঠিক নয় এবং তা প্রচলিত হারের চেয়ে কম তাহলে তাদের খাজনা অবশ্যই বাড়িয়ে দেওয়া হতো)।'[৩৪] অর্থাৎ এই আইন জারীর পূর্বেই নীলকর সাহেবরা জমিদারদের মত যে কোন সময় খাজনা বৃদ্ধি করার ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এই কারণেও কৃষক শোষণের শিকার হত। ফলে কৃষকদের মাঝে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে যা ১৮৫৯ সালে বিস্ফোরিত হয়। এই বৎসর নদীয়া জেলা সদর ও কৃষ্ণ নগরে বসন্তকালীন নীলচাষের জন্য কৃষকরা দাদন নিতে অস্বীকার করে। এরপরই পাবনা সিরাজগঞ্জ- মুর্শিদাবাদে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এবং পরের বৎসর যশোর জেলায় প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়। নিবারণ পণ্ডিতের গানে আদালতের ভূমিকা নিয়ে যে প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে ব্লেয়ার বি. কিংয়ের বইয়ে তারও সত্যতা মেলে :

> নীলকররা শীঘ্রই আবিষ্কার করে ফেলে যে, আইনগত ন্যায়পরায়ণতার প্রতি ম্যাজিস্ট্রেটদের সামান্যই উৎসাহ রয়েছে। এপ্রিলের শেষ নাগাদ জেমস ফোরলঙ-এর পথ অনুসরণ করে নীলকররা চুক্তি ভঙ্গের শত শত মামলা দায়ের করা শুরু করে। আর ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিজেরাই নীল বপন করতে এবং এমনকি নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য অজ্ঞ রায়তদের আতংকিত করতে নীলকরদের সঙ্গে যোগ দেন। গ্রামের মাতব্বরকে গ্রেফতার করা কিংবা নীলচাষে অনাগ্রহী রায়তের কঠোর জরিমানা দণ্ড ও তিনমাসের কারাদণ্ড প্রদান

> ছিল ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য নেহায়েতই মামুলি ব্যাপার। কারাবন্দী রায়তরা নীলচাষে সম্মতি প্রদান না করা পর্যন্ত কারারক্ষীরা তাদের উপর প্রচণ্ড জুলুম চালাত।[৩৫]

এমনকি পক্ষপাতদুষ্ট রায় প্রদানের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট তিরস্কৃত হয়েছেন সে প্রমাণও পাওয়া যায়। 'নীল বিদ্রোহের সময় সর্বাধিক নিন্দিত কর্মকর্তা ছিলেন যশোরের যুগ্ম কমিশনার সি বি স্কিনার। পক্ষপাতদুষ্ট বিচারের জন্য তিনি কেবল লেফটেনেন্ট গভর্নর কর্তৃকই নয়, তৎকালীন দায়রা জজ ডব্লিউ এস সিটনকার কর্তৃকও একাধিকবার তিরস্কৃত হয়েছিলেন।'[৩৬] বস্তুত নিবারণ পণ্ডিত সময়েরই নয় তার পিছনের শোষণের ইতিহাসও তুলে এনে চরম ক্ষোভ-ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

আর সবকিছুর মাঝে নিবারণ পণ্ডিত সর্বোতভাবে একজন আশাবাদী মানুষ। আর একজন আশাবাদী মানুষই পারেন প্রতিবাদী হতে। তার গানে তাই নুতনের জন্য, শোষণমুক্তির জন্য সুন্দর জীবনের জন্য আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে ঃ

ভূতে ধরা ভাঙ্গা বাড়ি, চল ভাই মেরামত করি
নতুন সাজে হইবে তৈয়ার–
দাও ভাঙ্গা চালে নতুন ছাউনিরে, ওরে আমার দেশবাসী ভাই
নতুন গান কণ্ঠে ধর, গঠন কর, নতুন সংসার॥

[নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ৭৩]

তার গানের মধ্য দিয়ে তিনি সবার মাঝে এক প্রতিবাদী চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াসী ছিলেন। প্রতিবাদের জন্য একতা ও সকলের সংহতি যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়টিও তিনি ভোলেননি। কারণ বিভেদ সৃষ্টি করে একতা নষ্ট করতে পারলে বেগবান যে কোন আন্দোলন হুড় হুড় করে ভেঙ্গে পড়ে। তার গানের মাঝে তিনি সেই সতর্কতাও দাবী করেন—

সবার বাঁচার দাবী নিয়া
চল সব এক হইয়া
নূতন সাজে হইবে তৈয়ার-
খুব হুঁশিয়ার চলতে হবে রে, ওরে আমার দেশবাসী ভাই
যেন সুযোগ বুঝে বিভেদ বুদ্ধি ঘাড় না মটকায় আর একবার॥

[নিবারণ পণ্ডিতের গান : ১৯৮৬ : ৭৪]

বস্তুতঃ নিবরণ পণ্ডিত তার গানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল মানুষের উপর যে শোষণ শাসন চলেছে তার প্রতিবাদ করেছেন। পণ্ডিতের গান শুধুমাত্র সময়ের দাবী মিটিয়েছে এমন নয়, তার গান সময়কে অতিক্রম করে এখনো শ্রোতাচিত্তে সাড়া জাগাতে সক্ষম। কিন্তু ইতিহাসকে যেমন প্রয়োজন আগামী দিনের সঠিক পথপরিক্রমার জন্য আর সেই ইতিহাস যেমন শুধু গদ্য লেখনীর মাঝে সঞ্চিত থাকে না, থাকে শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের মাঝে, নিবারণ পণ্ডিতের গানের মাঝেও তেমন আছে ইতিহাসের উপাদান। আছে এদেশের খেটে খাওয়া মানুষের শোষণ-বঞ্চনার কাহিনী আর প্রতিবাদকল্পে রচিত পংক্তিমালায় এক দ্রোহী মনের খোঁজ। নিবারণ পণ্ডিতের গান তাই আজও প্রাসঙ্গিক অতি প্রয়োজনীয়।

তথ্যসঙ্কেত

১। *নিবারণ পণ্ডিতের গান*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত একাডেমী, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা -৫

২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫−৬

৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -৭

৪। Taj ul-Islam Hashmi, Peasants Utopia The Communalization of Class Politics in East Bengal, 1920 -1947 University Press Limited, Dhaka, 1994, page -96

৫। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ কলকাতা, বৈশাখ ১৪০১, পৃষ্ঠা-৫৩

৬। প্রগতি মাইতি, সম্প্রদায়িকতা ও ভারতের রাজনৈতিক দল, পত্রলেখা, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা -২৫

৭। নজরুল ইসলাম বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, আজকাল, সম্পাদক, অশোক দাশগুপ্ত কলকাতা, ১৪−২, পৃষ্ঠা-৪৬১

৮। রমিলা থাপার হরবংশ মুখিয়া বিপন চন্দ্র, সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত ইতিহাস রচনা, কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা -৫৫

৯। Taj ul-Islam Hashmi, Peasants Utopia The Communalization of Class Politics in East Bengal, 1920-1947 University Press Limited, Dhaka, 1994, page 136

১০। মনি সিংহ, জীবন সংগ্রাম, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-৭২

১১। নজরুল ইসলাম, বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, আজকাল, সম্পাদক, অশোক দাশগুপ্ত, কলকাতা, ১৪০২ পৃষ্ঠা -৪৬০

১২। আবদুর রউফ মুক্তমনের সংকট সংখ্যালঘু, দলিত, খণ্ড জাতীয়তাবাদী এবং প্রতিবেশী প্রসঙ্গ ১৯৯৩ −১৯৯৭ র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৫৫

১৩। ড. বিনতা রায় চৌধুরী, পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য. সাহিত্যলোকে, কলকাতা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১১

১৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫

১৫। সৈয়দ আজিজুল হক, পঞ্চাশের মন্বন্তর ও মানিক মন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা. পঞ্চদশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন ১৯৯৭, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬৪

১৬। ড. বিনতা রায় চৌধুরী. পৃষ্ঠা-১৪

১৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫

১৮। শোভন সোম. পঞ্চাশের মন্বন্তর ও জয়নুল আবেদিনের ছবি, অনুষ্টুপ, উনত্রিংশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ১৯৯৪, সম্পাদক ঃ অনিল আচার্য. কলকাতা, পৃষ্ঠা-২১৯-২২০

১৯। ড. বিনতা রায় চৌধুরী. পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলাসাহিত্য. সাহিত্যলোক, কলকাতা. ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭. পৃষ্ঠা -১৯

২০। Taj ul- Islam Hashmi, Peasants Utopia The Communalization of Class Politics in East Bengal, 1920-1947, Universtiy press limited Dhaka. 1994, Page-196.

২১। মনি সিংহ, জীবন সংগ্রাম, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-৪৭

২২। Dipankar Bhattacharyya, Peasants Movements in Bengal and Bihar, Rabindra Bharati University, Calcutta, First Education 1992, Page-47

২৩। মনিসিংহ, পৃষ্ঠা-১১২-১১৩

২৪। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশভাগ দেশত্যাগ. অনুষ্টুপ. ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬০-৬১

২৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬২

২৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮

২৭। প্রাগুক্ত. পৃষ্ঠা-৬৪

২৮। প্রাগুক্ত. পৃষ্ঠা-৬৯

২৯। সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, বঙ্গসংহার এবং চতুরঙ্গ বর্ষ ৬১ সংখ্যা ১ বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৮, কলকাতা. পৃষ্ঠা-৪৮

৩০। সন্তোষ গুপ্ত, সমাজতন্ত্রের অন্য ইতিহাস, ইউনির্ভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা. ২০০০. পৃষ্ঠা-৫৬

৩১। প্রাগুক্ত. পৃষ্ঠা-৫৭

৩২। ব্লেয়ার. বি. কিং নীল, বিদ্রোহ বাংলায় নীল আন্দোলন ১৮৫৯-১৮৬২ অনুবাদ: ফরহাদ খান ও জুলফকার আলী, আইসিবি এস. ঢাকা. ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৪

৩৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪২

৩৬। প্রাগুক্ত. পৃষ্ঠা-১০৫

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬০